## একক ২ ❑ কবিতার শৈলীবিচার


২.১ আমাদের দৃষ্টি

২.২ কবিতার শৈলী

২.৩ গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব

২.৪ জীবনানন্দ দাশের 'পরস্পর'


## ২.১ ❑ আমাদের দৃষ্টি

এই অংশে আমরা শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োগসামর্থ্য দেখাতে চাই। সাহিত্যের মাধ্যম এক নয়, অনেক। তাই কবিতা, গদ্য, ছোটোগল্প ও উপন্যাসের শৈলী ক্রমান্বয়ে আলোচিত হবে। এদের শৈলীমানকগুলি (স্টাইলিস্টিক প্যারামিটারস) একজাতীয় নয় বলে প্রতিটি সাহিত্যমাধ্যমের শৈলী আলোচনার গোড়ায় এদের শৈলীবৈশিষ্ট্য সন্ধানের উপায় আলোচিত হবে। পরে একটি বিশেষ রচনার মধ্যে আমরা বিশ্লেষণের আলো ফেলব।

এ পর্যন্ত লেখা শৈলী ও শৈলীবৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রতীচ্য গাঢ় এবং অশুভ প্রভাব ফেলেছে। একটি বিদেশি শৈলীবৈজ্ঞানিক প্রতিরূপকে বাংলা রচনা বিশ্লেষণের আদর্শ করলে ভুল বাড়তে বাধ্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ধর্মকে অমান্য করে বিদেশি ছাঁচে তার সমালোচনা একান্ত দূরের, কৃত্রিম ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমরা প্রতীচ্যের ধারণা মনে রেখেও যে প্রতিরূপগুলি নেব, তা স্বদেশি চেহারা নেবে। প্রতীচ্যের সাহিত্যিক শৈলীবিজ্ঞান সাহিত্যকে দেখার নূতন দৃষ্টিকোণ উপস্থিত করেছে। আমাদের আলোচনায় সেই দৃষ্টিকোণ রাখতে গিয়ে সতর্কতা দরকার। নইলে শৈলীবিজ্ঞানের মানকগুলির সঙ্গে সমঝোতা করে সমালোচনার উৎপত্তি হবে।

একটি কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি যে বাঁধা ছক মেনে চলে না, এটা মনে রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া সে যে নূতন শৈলীবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য জানাবে না, এমনটি কখনও বলা যায় না। কাজেই সমালোচনার শৈলীবৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করার প্রয়োজনীয়তা পূর্বাহ্ণে থাকবে। পোশাকের মাপে যেমন চেহারা হয় না, তেমনি মানকের মাপকাঠি কৃতির আগে থাকবেই, এমন নয়। এখানে গোঁড়া শৈলীবিজ্ঞানীরা আপত্তি তুলবেন। কিন্তু তাঁরা তো এও জানেন যে, শৈলীবিজ্ঞান এখনও একটি সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়নি। এর প্রায়োগিক সফলতা এখনও অনুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। আপাতত এটি কৃতির ভাষাগত প্রকাশের নান্দনিক ক্রিয়াকে গভীরভাবে লক্ষ করেছে।

আবার ভাববাদী সমালোচনায় ধোঁয়াটে, অগভীর ব্যাখ্যানে আমরা ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নূতন সমালোচনা পদ্ধতি এলেই সমালোচক এবং রচয়িতা মহলে 'সব কিছু ধ্বংস করা হচ্ছে' এরকম ধারণা জাগে। বাংলায় তন্ময় সমালোচনার পরিমাণ কম। মন্ময় সমালোচনা আমাদের নূতন চোখে সব কিছু দেখতে নিষেধ করে। এই সময়

সমালোচনার চাপে যখনই লেখক-সমালোচক সাহিত্য-কৃতির ব্যাখ্যা করেন, তখনই নিয়তিকৃতনিয়মরহিত অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার কথা উচ্চারিত হয়। রস, পূর্ণতা, অখণ্ড সৌন্দর্য, প্রতিভা—এসব শব্দের আড়ালে বিশ্লেষণের অপূর্ণতাকে (কিংবা অক্ষমতাকে) লুকানো যায়। রচক কীভাবে তাঁর প্রকাশকৌশলের বিন্যাস-সমাহারে আমাদের মনে দ্বিতীয় ভুবন জাগিয়ে তোলেন, তার একটা হদিশ দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। আমরা মনে করি, রচকের সৃষ্টিশীল মন ভাষার বহিরঙ্গ উপায়ে এবং উপায়ের নবীনতায় এই কাজ সম্ভবপর করে তোলে। সাহিত্য-সমালোচনাকে যদি শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সক্রিয় করা যায়, তাহলে অনেক অযথার্থ কথা এড়ানো যাবে। আবার স্রষ্টার মনের অন্তরালের গভীরতার পরিমাপও সম্ভব হবে।

এই কাজে তাই প্রচলিত সমালোচনার সদর্থক (পজিটিভ) ধারণা এবং সাহিত্যিক শৈলীবিজ্ঞানের মিশ্রণ একান্ত আবশ্যক। রক্ষণশীল লেখক এবং সমালোচক এই বলে আপত্তি জানাতে পারেন যে এখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রজাপতির পাখনা বা রামধনুর রং-কে দেখা হচ্ছে। আসলে এই খণ্ড করে দেখার মধ্যে অখণ্ড প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশি। সাহিত্যকৃতি পাঠককে যদি বিস্ময়রসে অবিষ্ট করে রেখে দেয়, তাহলে দুপক্ষেরই ক্ষতি। কেননা বিস্ময় প্রাথমিকভাবে মনকে অসাড় করলেও জগতে সেই বিস্ময়ের প্রকৃতি ও কারণ খোঁজা মানুষেরই কর্তব্য। এই বিস্ময় যে অনিয়মিত নয়, লেখক যে প্রথম ভুবনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় ভুবন গড়েন—এই প্রতিপাদ্য অস্বীকারের উপায় নেই। তাই আমরা এই পর্বে স্রষ্টার মনোগহনের জটিলতা অনুভব করতে চাই যৌক্তিক দৃষ্টিকোণে। এখানে সাহিত্যবোধ হল প্রথম শর্ত। যৌক্তিক প্রবাহের খাতিরে সাহিত্যবোধের বিসর্জন নয়, নবতর উদ্বোধনই আমাদের কাম্য।

## ২.২ ❑ কবিতার শৈলী

এই উপ-শিরোনামটি (সাব-হেডিং) নিজেই একটি বড়ো বইয়ের বিষয় হতে পারে। আমাদের লক্ষ্য মনে রাখলে এখানে কবিতার সার্বিক বিশ্লেষণে আমরা মনোযোগী হতে পারি না। বরং নবীন আলোচকের মনে কিছু প্রশ্ন সঞ্চার করতে পারি। এসব প্রশ্নের সমাধান আমরা দেখাতে চাই না। শুধু এই সমস্যা এবং প্রশ্নাবলি আমাদের প্রচল কাব্যসমালোচনায় উঠুক, এই কামনাই করি।

### ১. গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব

প্রচল আলোচনায় গদ্য-পদ্যের সীমারেখা টানা হয়। এই সীমানা টানা শৈলীর প্রয়োজনে কতটা লাগে? শৈলীর সাধারণ অভিজ্ঞতা বলে যে, গদ্য-পদ্যের সেভাবে ভেদরেখা নেই। সুবোধ্য এবং সুসঙ্গত অভিজ্ঞতার ধরন গদ্য বা পদ্য যে-কোনো রূপ নিতে পারে। এই রূপগ্রহণ কতকগুলো পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল, যাকে পরিস্থিতির সমাপতন (কো-ইনসিডেন্স অব সারকামস্ট্যান্সেস) বলা ভালো। এখানে যুগের হাওয়া সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে। একটা যুগে শৈল্পিক এবং সাহিত্যিক কিছু আঙ্গিক শিল্পীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। শিল্পী সেই চাপকে অমান্য করতে পারেন না। কারণ,

১) তাঁকে জীবনধারণ করার জন্য লেখকবৃত্তি বেছে নিতে হয়। তাঁর লেখা পণ্য বলে যুগের আদেশ মানতে হয়;

২) বেশিরভাগ শ্রোতা বা পাঠকের কাছে পৌঁছতে হলে যুগ-প্রচল প্রকরণকে বরণ করে নিতে হয়।

বাংলা সাহিত্যের পুরানো পৃষ্ঠা ওলটালে দেখা যাবে যে, এই ভবিতব্যকে বরণ করার জন্য লেখককে কত আত্মত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন যে, মুকুন্দরাম এ যুগে জন্মালে ঔপনাসিক হতেন। অনিবার্যভাবে তাঁর বাস্তবতাবোধ, বিশদতাজ্ঞান (সেন্স অব্ ডিটেইলিং), চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্য, সংলাপ-বয়ন এবং জীবনদৃষ্টি সমালোচককে এমনতরো বাক্য উচ্চারণে উৎসাহিত করেছে। মুকুন্দরাম এ যুগে একজন ঔপন্যাসিক না হলেও সার্থক গদ্যকার যে হতেন, এতে সন্দেহ নেই। অথচ চণ্ডীমঙ্গলের লোকমান্য কবিরূপেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। মুকুন্দরাম যুগের দাবি কবিভাষার প্রভাব অগ্রাহ্য করে গদ্যভাষায় লেখার চেষ্টা করেননি। অথচ সে যুগে গদ্য ছিল না, এমন নয়। কিন্তু তার সাহিত্যিক ব্যবহারযোগ্যতা স্বীকৃত হয়নি।

অন্য দিকে কৃষ্মদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত পদ্যে লিখলেও এক নৈয়ায়িক, গদ্যচারী মন তাঁর রচনার সর্বাঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। মুকুন্দরাম-কৃষ্মদাস কেউই পদ্য ছাড়া গদ্যসাধনা করেননি। পদ্যের ছন্দোবন্ধন, মিলের প্রকৃতি, বিশেষ কবিভাষ্য কৃষ্মদাসের রচনার অন্তর্নিহিত গদ্য-সম্ভাবনাকে আড়ালে রাখতে পারেনি। এমনকি এই ধরন অন্য কয়েকজন কবির ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। গোঁড়া সমালোচক বলবেন, এখানে কাব্যের অপূর্বত্ব এরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখি এসব জায়গায় মানুষের মুখের ভাষা, যুক্তির রীতি, জীবন-বিশ্লেষণ একটা গদ্যের ভাব জাগিয়েছে। একটি অনুভবের চূড়ান্ত মুহূর্তে নয়, একে যুক্তি-তর্কের বাঁধনে তারা বেঁধেছেন, যেমনটি সচরাচর জীবনে ঘটে থাকে। দুটি উদ্ধৃতি এই বক্তব্যের সমর্থন জানায় :

১. কিংবা প্রেম রসময় কৃষ্মের স্বরূপ।
তার শক্তি তার সহ হয় একরূপ।।

২. শেষলীলায় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ।।

গদ্য-পদ্যের দ্বন্দ্বে আরেকটি কথা উচ্চরিত হয়। তা হল সাহিত্যের আদি মাধ্যম হল পদ্য, গদ্য পরে এসেছে। রবীন্দ্রভাষায় 'গদ্য এল অনেক পরে'।

তাহলে এখানে মেনে নেওয়া ভালো যে, সমস্ত প্রকাশকে ছন্দোবন্ধনে বাঁধা গেল না দেখে গদ্যের ব্যবহার শুরু হল। গ্রিকরা অনেক আগেই বুঝেছিলেন যে, ছন্দোবন্ধনে যুক্তবন্ধ চিন্তার যথাযথ ভাব অনুসরণ করা সম্ভব নয়। মানুষ দেখেছে যে, বৌদ্ধিক যুক্তি হল যুক্তির নৈয়ায়িক অবয়ব। গদ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজগুলোর সংপ্রেষণ-কর্ম সম্ভব হলেও নান্দনিক হয়ে উঠতে সময় লেগেছে। বাংলা গদ্যের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়। বাংলা গদ্যে বিষয়ানুগ ভাব কাটিয়ে সাহিত্যযুগ দরকারের জগৎ থেকে অদরকারের জগতে তাকে পৌঁছে দিয়েছে।

এই প্রশ্ন থেকে আরেকটি প্রশ্নের জন্ম হয়। শুধু গদ্যের কি কোনো আলাদা বিষয় আছে এবং কবিতারও? ধরা যাক, একটি চিন্তার যথাযথ রূপ দিতে গেলে গদ্যেরই প্রয়োজন। ছন্দ, স্পন্দ এবং মিল এ বিষয়ে বাধা। কিন্তু গদ্য যথাযথ চিন্তার ভাষারূপেই নয়, বর্ণনার ক্ষেত্রে এই কাজ করে থাকে। একটি বর্ণনা তা রাস্তা, শোবার

ঘর, অরণ্যভূমি কিংবা একজন জেলখাটা আসামীর যাই হোক না কেন, তা গদ্যেই সম্ভব। এর সঙ্গে জড়িত মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি তার বর্ণনার বাইরের বিষয়। কিন্তু এ ধরনের গদ্য শৈলী-আলোচনায় অতিরেক (রিডানডেন্ট)। কেননা এখানে যথাযথতা থাকলেও কল্পনার উদ্দীপন নেই। এবারে তাই মানসিক প্রতিক্রিয়ার মূল খুঁজে দেখা যাক একটি গদ্যান্বয়ী কবিতা থেকে :

সাপমাসী উড়ে যায়; দাঁড়কাক অশ্বত্থের নীড়ের ভিতর
পাখনার শব্দ করে অবিরাম; কুয়াশায় একাকী মাঠের ঐ ধারে
কে যেন দাঁড়ায়ে আছে; আরো দূরে দু-একটা স্তব্ধ খোড়ো ঘর

পড়ে আছে; খাগড়ার বনে ব্যাং ডাকে কেন—থামিতে কি পারে;
(কাকের তরুণ ডিম পিছলায়ে পড়ে যায় শ্যাওড়ার ঝাড়ে।)
মানুষের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে—হাসির
আস্বাদ পেয়ে গেছি.....

এখানে গদ্যকাব্যের প্রভাব বেশি বর্ণনভঙ্গিতে। কিন্তু শেষ দুটি লাইনে কবির মানসিকতা বর্ণনা থেকে রচনাটিকে কাব্যে উত্তীর্ণ করেছে। এখানে গদ্য ও পদ্যের সহাবস্থান ঘটেছে প্রয়োজন অনুযায়ী।

গদ্য-পদ্যের দ্বন্দ্ব নিয়ে তৃতীয় সমস্যা হল, এই গদ্যান্বয়ী ভাব কবিতা ও পদ্যাকৃতি রচনার কোন্ কোন্ বিশেষ স্থলে আসে, তা স্থির করা যায় কিনা। প্রথমে দেখি নাটকীয় সংলাপের মুহূর্তগুলি যেখানে চরিত্ররা নিজেদের বক্তব্য বলতে গিয়ে দেখছে যে, পদ্যরূপের গঠনে তাকে ধরার উপায় নেই। সেখানে প্রতিদিনের জীবনে বলা ও শোনা গদ্য অনিবার্যভাবে ক্রিয়াশীল হচ্ছে। যেমন :

এ কি ফাঁকি? না কি বুজরুকি? কোথায়
সূর্য? এরই জন্য এই শীতে এলুম নাকি?
আরে দাঁড়াও, এক্ষুণি দেখবে।
পিছনে চোখ রেখো, দেখছো এভারেস্ট?
কাঞ্চনজংঘা কী গ্র্যান্ড!

(টাইগার হিল-এ সূর্যোদয় : নুতন পাতা, বুদ্ধদেব বসু)

আবার যেখানে ধর্ম-দর্শন-আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রয়োজন, সেখানেও কবিতা গদ্যাকৃতি ধারণ করেছে। মিল এখানেও আছে হয়তো। কিন্তু তা কবিতার বাইরের ঠাট বজায় রাখার জন্য। বিপ্রতীপরূপ (ইনভার্সন) বা কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার বিপর্যাসও একই কারণে স্থান পায়। অর্থাৎ লেখার জগতেও বক্র কবিভাষার চেয়ে প্রত্যক্ষ, সংপ্রেষক গদ্য বেশি কার্যকর রূপ নিয়েছে। যেমন :

বউও উঠানে নাই—পড়ে আছে একখানা ঢেঁকি;
ধান কে কুটিবে বল—কত দিন সে তো আর কোটে নাকো ধান.....
ভাঁড়ারে ধানের বীজ কলায়ে গিয়েছে তার দেখি,
তবুও সে আসে নাকো, আজ এ দুপুরে এসে খই ভাজিবে কি?

(রূপসী বাংলা : জীবনানন্দ)

গদ্যভাষার লিখিত রূপের কোনো উপভাষা নেই—একথা ঠিক। কিন্তু একেবারে গদ্য এবং গদ্যান্বয়ী কবিতার মধ্যে ফারাক আছে। এখানে গদ্য-পদ্যের এক আপোষকামিতা দেখা যাচ্ছে।

এসব উদাহরণে কবি বাঁধা সড়ক থেকে সরে আসছেন—এমন অভিযোগ করা যায় না। বরং কবি ভাষার সুপ্রয়োগের ধারণাটি যথার্থ বলবৎ করছেন, এমন বলা চলে। ভাব এখানে উপযুক্ত ভাষা খুঁজছে। তাই তা কবিতার গণ্ডি না পেরোলেও গদ্যরূপকে হেলাফেলা করতে পারছে না।

আলোচ্য অংশের শেষ প্রশ্ন গদ্যকবিতা নিয়ে। ওপরের অবস্থাগুলো কী কী গদ্যকবিতার আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করেছে? এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কেননা সাহিত্যে পদ-কবিতারূপের পরে গদ্যের সূচনা হল (অন্তত লিখিতরূপে)। কবিতার ক্ষেত্রে গদ্যকবিতা এল আরও পরে। কবিতার প্রচলিত পথে কিছু কথা বলা অসম্ভব কিংবা কবিরা নূতন সাহিত্যরূপের কামনা করেছিলেন? পদ্যছন্দকে সরিয়ে দিয়ে গদ্যকে আশ্রয় করা ছন্দের বন্ধনমুক্তি নয়। ছন্দোমুক্তি হল পর্ব-সুষমার বন্ধনকে ভাঙা।

কেউ কেউ আবার কবিতার চর্চা করেছিলেন গদ্যের জগতে বসেই। সেখানে ছন্দোমুক্তির প্রশ্ন অবান্তর। আসলে তাদের মনে হয়েছে গদ্য সরাসরি বা একটু বেশ পালটে কবিতায় আসতে পারে। গদ্যকবিতায় সবচেয়ে বড়ো হল—সংক্ষিপ্ত বাক্‌পর্ব, দ্রুত-নিয়মিত যতিপাত, সঘন শ্বাসাঘাত, মূল গদ্যের থেকে আলাদা এক স্পন্দনের সঞ্চার। এ কাজ করতে গিয়ে বিপ্রতীপ বাক্য, ক্রিয়াহীন বাক্য এবং সমান্তরালতা গঠনের প্রয়োজন আছে। এই কাজ কোনো আধুনিক কবিও স্বস্তির সঙ্গে করে উঠতে পারেন না। আসলে কবিতার প্রথম আর শেষ শর্ত হল, কবিতা হয়ে ওঠা। যদি প্রশ্ন ওঠে, তা কি করে বুঝব? উত্তর—আগের পড়া কবিতা যেভাবে মনকে আনন্দিত, যন্ত্রণার্দ্র, রক্তাক্ত করেছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে। প্রাক্তন কাব্যপাঠের অভিজ্ঞতা হল পরশপাথর। নূতন কাব্যরচনা সোনা না গিল্টি, তার স্পর্শেই তা বুঝতে পারা যায়।

আমরা শৈলীবিজ্ঞানের তত্ত্বালোচনার সময় কবিতায় আদর্শ ভাষার শব্দ এবং অন্যান্য স্তরের শব্দ নিয়ে আলোচনা সাধ্যমতো করেছিলাম। কবিতার শৈলী অংশে এ বিষয়ে বিশদ হওয়ার সুযোগ আছে। কাব্যভাষাকে আদর্শ ভাষার একটি প্রতিরূপ বলা যায় না, জাঁ মুকারোভস্কি বলেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, ইতর শব্দমেশানো কবিতায় শাব্দিক উপাদান আদর্শ ভাষা থেকে নেওয়া হয় না। যেমন, মরকুটে, থ্যাঁতানো, উজবুক। আবার কবিতার বর্ণনা অংশে আদর্শ ভাষারূপের মধ্যে নূতন উপভাষা বা ইতর সংলাপ পাশাপাশি থাকে। কাব্য-ভাষার নিজস্ব শব্দ এবং বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ থাকে, এমনকি ব্যাকরণগত রূপও। যাকে শাদা কথায় বলতে পারি কাব্যিকতা (পোয়েটিজম)। আদর্শ ভাষারূপ শক্তিশালী থাকলে, এর নিয়মভঙ্গ বিচিত্র হবে। এই সূত্র ধরে কবিতার সৃষ্টি সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ভাষাগত উপাদানের জোরালো প্রমুখণ ছাড়া কবিতা হয় না। হাব্রানেক বলেছিলেন : "বাই ফোরগ্রাউন্ডিং...উই মিন দা ইউজ অব দা ডিভাইসেস অব ল্যাংগুয়েজ ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট দিস ইউজ ইটসেলফ অ্যাট্রাক্টস অ্যাটেনশন অ্যান্ড ইজ পারসিভড্ অ্যাজ আনকমন, অ্যাজ ডিপ্রাইভড অব অটোমেটিজম, সাচ অ্যাজ আ লাইভ পোয়েটিক মেটাফর।"

(স্ট্যান্ডার্ড চেক অ্যান্ড দা কালটিভেশন অব গুড ল্যাংগুয়েজ, বহুশ্লাভ হাব্রানেক, ১৯৩২)

কবিতাকে কবিতারূপে চেনার পরও পাঠকের কাছে সমস্যার সংখ্যা কমে যায় না। যেমন :

প্রমাবিরহিত
অন্ধবিশ্বাসের বশে তখন মানুষ খোঁজে ফের
অশক্ত বা অসম্পৃক্ত অধিদৈবতের
পুরাতন পদপ্রান্তে সংগতি বা পৈত্রিক অমিয়,
কার্যত যদিও
ঐকান্তিক, শূন্য তারে করে বিশ্বম্ভর;
কারণ তখন বায়ু অনিলে মেশে না, অবস্কর
ভস্মান্ত হয় না, অনুব্যবসায়ী ক্রতু

(বোঝে সন্তাপেও ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীতাগ্নি বেপথু, সংবর্ত : সুধীন্দ্রনাথ)

'সংবর্ত' কবিতার এই অংশ পড়ে পাঠকের প্রথম প্রতিক্রিয়া জাগে দুর্বোধ্যতার। দুর্বোধ্য বললেই সব দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। কেননা 'দুরূহতার দুটো দিক আছে, একটা পাঠকের দিক, একটা লেখকের দিক। যে দুরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যে তার জন্য কবির উপরে দোষারোপ করা অন্যায়।' এই দোষারোপ ন্যায়-অন্যায় যাই হোক, বর্তমান কালে পাঠকেরা বহুজ্ঞানী রূপের পক্ষপাতী। পাঠকের কাছে কবিতা হাতের মুঠোয় আমলকীর মতো সহজলভ্য হবে, এটা কবিরা মানেন না। কেননা একালে জ্ঞানের সীমানা অনেক প্রসারিত। সেখানে শুধু ছন্দমিল, সামান্য কথার বিলসন তাদের কাছে শক্তির অপব্যয়।

আধুনিক যুগের জটিল পরিচয়কে প্রকাশ করার ধরন পালটে গেছে। পুরোনো কাব্যিক শব্দেরা এখন নিষ্প্রাণ। তাই কবিকেও ভাষা-পাথরের বুকে সন্ধান চালিয়ে তক্ষণ করে খুঁজেনিতে হয় নিজের বলার কৌশল। এই কৌশল গ্রহণে কবি যেমন শ্রমশীল, পাঠককেও তেমনি পরিশ্রমী হতে হবে। আলোচ্য অংশে যে দুরূহতা জাগে, তা আপাত। কঠিন শব্দের অর্থ উদ্ধার করে পাঠক দেখেন তার চারপাশের অভিজ্ঞতাকেই আঁকা হয়েছে। কিন্তু সেই ছবির রং তার চেনাজানা রংয়ের বিন্যাস থেকে আলাদা।

এ তো গেল শাব্দিক দুরূহতার দিক, যেখানে শব্দার্থের খোলশ ছাড়িয়ে কাব্যের সার গ্রহণ করা যায়। কিন্তু অনেক সময় কবিরা বহুপঠনের অভ্যাসে এমন সব উল্লেখ, উদ্ধৃতি, প্রসঙ্গ তোলেন, তা তাঁর একান্ত হলেও পাঠকের কাছে বাধাস্বরূপ। এখানে সংপ্রেষণের চেয়ে নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞানতৃষ্ণা, পঠনাভ্যাস এবং একটা চেষ্টিত উপমা যেন সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন :

উভয়ত তুমি সেতুবন্ধনে চিরবনবাসী স্বপ্ন—
সনাতন এক অবাকশাখায় মিলিত দুই সুপর্ণ।
তাই ক্ষোভ নেই অকালের অনুতাপ,
কারণ তোমার বাস্তবতাই যেন দৈনিক অন্ন
তদু নাত্যেতি বচন
বুভুক্ষু দেশে জীবনের মূল সত্যে।

(উজ্জীবনের স্বপ্ন সদ্য চক্ষে, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত : বিষ্ণু দে)

এখানে প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখ উজ্জ্বল উদ্ধার নয়। সমস্ত কবিতাটি পড়লে পাঠক দেখবেন এক অপার

কাঠিন্য ছড়িয়ে আছে। কবিতাটির আবেদন আমাদের কাছে পৌঁছনোর পথে প্রবল বাধা হল এসব উল্লেখের অবারিত প্রাচুর্য। দুর্বোধ্যতার আরেকটি কারণ হল অবয়বী (স্ট্রাকচারাল)। এখানে দুরূহ উল্লেখ, শাব্দিক কাঠিন্য কম। অথচ অবয়ব থেকে কবিতার অর্থ বোঝা দুরূহ। এখানে প্রকরণের অতি-সচেতনতা পাঠককে অসুবিধায় ফেলে :

বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না।
সাম্য অতি খাসা চিজ!—অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ।

'জীবন বিস্বাদ লাগে!'—ইত্যাদিতে ইতস্তত দেনা
এবার আত্মাকে, বন্ধু করা যাক প্রত্যাহার (অহো!
সম্প্রতি মাঘের দ্বন্দ্বে ছত্রভঙ্গ দক্ষিণের সেনা।
সদলে বসন্ত তাও পদত্যাগ-পত্র পাঠাবে না?)

(ভিলানেল, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার : বিষ্ণু দে)

এখানে একটি আপাত-মিল কাজ করেছে—ক গ, খ ঘ, গ গ গ। অথচ পারম্পর্যহীনতা, একটু যেন চেষ্টিতভাবে দুরূহ করার প্রবণতা কবির আছে। এই ভাবের উল্লম্ফন অনেক সময় কবিতায় দুরূহতা আনে।

## ২.৪ ❑ জীবনানন্দ দাশের 'পরস্পর'

কবিতার শৈলীতে তাই আমরা গদ্যান্বয়ী অংশ, দুর্বোধ্যতা, মূল সুর, লেখকের চিত্রকল্প, প্রকরণের সঙ্গে প্রসঙ্গের মিল-অমিল, উল্লেখের বৈচিত্র্য, অলংকারের পরিমাণ, বাক্যের গড়ন এবং সর্বোপরি অবয়বজ্ঞান লক্ষ করব। কবিতার শরীরে লেখকের মন কতটা ধরা পড়েছে, এটা জানা দরকার। এই কাজ করতে গেলে খুব পরিচিত একটা কবিতা বাছলে ভালো হত। আমরা একটি অল্প-চেনা কবিতা নির্বাচন করেছি। কবিতাটির নাম 'পরস্পর', লেখক জীবনানন্দ দাশ। কবিতাটি গড়ন, বক্তব্য এবং যুগের ছবিতে আমাদের ভাবিয়েছে। এই ভাবনা কেন জাগল, তার উত্তর খুঁজতেই আমাদের আলোচনা চলবে। এখানে বলা ভালো কবিতাটি দীর্ঘ। কারোর কারোর মতে দীর্ঘ কবিতা আসলে খণ্ড কবিতারই মালা। একটি কবিতার শৈলীবিচার সম্ভব হলেও দীর্ঘ কবিতায় তা সম্ভব নয় বলে তাঁরা মনে করেন। দুটি মতামতই চরম।

জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র এই কবিতাটি কাব্যরসিক মহলে প্রায় অনালোচিত। অথচ কবিতাটিতে বক্তব্য ছাড়াও শৈলীর বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাই। এমনকি জীবনানন্দের বিশেষ প্রবণতা বোঝাতে এই কবিতাটির মূল্য আছে। কবিতার কথা জানতে গেলে জীবনানন্দের সুখ্যাত কবিতাগুলির পাশে এটির মূল্য আছে। জীবনানন্দের কাব্যিক জীবনের প্রাথমিক ভাঙচুরের কথাও এই কবিতা থেকে জানতে পারি। অন্যদিকে এটি সংক্ষিপ্ত নয়, দীর্ঘ কবিতা। এর মধ্যে কাহিনি বয়নের ঢং আছে। প্রাচীনকালের নারী থেকে একালীন পণ্যার মধ্যে নারীচেতনার একটা পরিবর্তনস্রোত লক্ষ করা যায়। সংলাপ আছে। আসলে এটি ছোটোগল্প না হয়ে কীভাবে কবিতা হল,

বিষয়ানুবন্ধতার দায় এড়িয়ে প্রমুখণ কৌশলে আমাদের কাছে জীবন্ত রূপক হল, তা এক আকর্ষণীয় ব্যাপার। এই ব্যাপার কীভাবে কবিমনে ও লেখনে প্রকাশ পেয়েছে, তার হদিশ এবার নেওয়া যাক।

কবিতাটির শুরুতে এক গল্পের আসর, যেখানে কবিই কথক। তিনি রূপকথা শোনান উপস্থিত সকলকে, এমনকি রূপকথার নায়ক (রাজ)কুমারকেও। একটি নিঃসাড় পুরী, পাহাড়, পালংকে শোয়া রাজকন্যার শরীর—রূপকথার সব আয়োজনই তিনি করেছেন। কিন্তু রূপকথার গল্পে লেখকের নিজের কথা থাকত না। একজন রূপসীর সন্ধানে পৃথিবীর পথে ঘুরে ঘুরে সেই রাজকন্যার সন্ধান তিনি পেয়েছেন। রাজকন্যা ঘুমের অতলে। কবি তার পাষাণের মতো হাতে প্রাণ জাগাতে পারেননি। এমনও সংশয় জেগেছে যে, হৃদয় থাকলেও তা কবির জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই বিনতি জাগে যদি রাজকুমার তার হাত ধরে হৃদস্পন্দন জাগান। এখানে প্রথম গল্প বা অংশের সমাপ্তি। এ যুগের লেখক রূপকথার জগতে প্রাণের স্পন্দন শুনতে পেলেন না। তার কারণ তিনি বুঝেছেন যে ঐ জগৎ আগেকার, সেখানে আধুনিক মানুষের হাত দিয়ে দ্বার খোলার উপায় নেই। আবার ঐসব অসাধারণ রূপবতীদের রূপ থাকলেও জীবন্ত ছিল না।

রাজকন্যার রূপচিত্রটি উদ্ধার করা যাক :

মসৃণ হাড়ের মত শাদা হাত দুটি,
বুকের উপরে তার রয়েছিল উঠি।
আসিবে না গতি যেন কোনদিন তাহার দু'পায়ে;
পাথরের মত শাদা পায়ে
এর যেন কোনদিন ছিল না হৃদয়

মসৃণ হাড়ের মতো শাদা হাত, পাথরের মতো গা আর যাই হোক জীবনের নয়। এই শুভ্রতা আমাদের কাছে প্রশংসনীয় নয়। যেমন বাংলায় আছে ক্যাটক্যাটে সাদা। আবার হাড় এবং পাথরের তুলনা একটা কাঠিন্য এবং নিষ্প্রাণতা সঞ্চার করেছে রাজকুমারীর ছবিতে।

(রাজ)কুমার দ্বিতীয় গল্পের কথক। তার চোখে নারীর অন্য রূপ ফুটে ওঠে। সেও ঘুমন্ত। এখানে পাহাড় নেই, নিস্তব্ধতা নেই, নদী আছে। সে নারী মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার মতো নয়, 'কিংবা—হবে তাই'। বসন্তের আহ্বানে তাকে দেখেছিলেন নদীর কিনারে 'জমানো ফেনার মত'। এ নারীও অচেতন। হাতির দাঁতের মতন শাদা হাতে শাদা স্তন ঢেকে সে শুয়ে আছে। এই দেখাও মায়াবী। নিবু-নিবু জ্যোৎস্নায় এই ছবি, স্বপ্নের এই প্রাণহীন প্রতিমা দিন বা বাস্তবতার প্রখর আলোয় মুছে যায়। রাজকুমার তার সন্ধান করেন। এ তো গেল প্রসঙ্গের কথা। নদীর দেশ বলতে গিয়ে যাতে আমরা বাস্তবের পরিচিত নদীর সঙ্গে তাকে মেলাতে না যাই, সেজন্য জীবনানন্দ তাঁর বিশেষ ধরনে জানান :

(পদ্মা-ভাগীরথী-মেঘনা—কোন্ নদী যে সে,—
সেসব জানি কি আমি!—হয়তো বা তোমাদের দেশে
সেই নদী আজ আর নাই—
আমি তবু তার পাড়ে আজো তো দাঁড়াই!)

বিরামচিহ্নগুলি এভাবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এক যুক্তির শৃঙ্খলা চোখের আড়ালে থাকে না। আবার 'ঘুম ফেঁসে যায়', 'ঘুম খসা'-র মতো ইতর শব্দ ব্যবহার করেছেন রূপকথার জগৎ আঁকতে। তবু বুঝি এ নারী

স্বপ্নে এলেও এর মধ্যে বাস্তবতার বীজ আছে। একটি বাস্তবতা, আবার ভিতরে অবাস্তবতার, কল্পনার সুর বোনা হল। বাসন্তী নারীর স্বপ্ন দর্শন রাজকুমারীর রূপের থেকে আলাদা। লক্ষণীয় যে অতীতের ধূসরতা, নিষ্প্রাণতা বোঝাতে শাদা বিশেষণটিকে কবি ছেড়ে দিতে পারেননি।

তৃতীয় গল্প আসে। এখানে পটও বদলে যায়। উত্তর সাগরের জল মেয়েদের কথা ওঠে। পাহাড়-নদীর প্রেক্ষিত বদলে সাগরের জলে এদের ভাসমান ছবি কবি আঁকেন। স্থল এখানে নেই। তাই বাস্তবের রক্তমাংসের সজীবতা (কাঁকরের রক্ত) সে দেখেনি।

এদের শরীর আগের দুই নারীর মতোই আবছা রহস্যময়তায় ঢাকা। এদের স্তন ঠান্ডা, শাদা বরফের কুচির মতন। ফেনার শেমিজের মধ্যে সারা শরীর পিছল। এদের চুল রূপোর কুচির মতো উজ্জ্বল। কাচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল চাঁদের বুক থেকে সাগরের বুকে ঝরে পড়ে দৃশ্যটিকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। সমস্ত পরিবেশ আবছা, আর্দ্র এবং শীতল হয়ে যায়। এই শীতল জগতেও প্রাণ নেই। তারাও ফেনার মতো ঠান্ডা আর শাদা। এই অংশেও সাগরকন্যাদের (মারমেইড?) রূপ আঁকতে গিয়ে সাধারণ শব্দের ব্যবহার কমে নি (বরফের কুচি, শেমিজ, পিছল, ঝিকমিক, মুক বুক ভিজে ইত্যাদি) পাশাপাশি 'কাচের গুঁড়ির মত শিশিরের জল' অংশটি দুবার আবৃত্ত হয়েছে। কবি উপমায় তাদের রহস্যঘেরা আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলবেন, এমন বাসনাই কাজ করেছে। আবার সমুদ্রের জল যেমন তরঙ্গিতভাবে বয়ে চলে, তেমনিই পুরো অংশ এক বহমানতা বজায় রেখেছে।

তিনটি গল্প, নাকি আরও হয়? সব কথা থেমে গেলে কবির মনে জীবনের নশ্বরতা, অনাগত কবির আবির্ভাব কথা জাগে। রূপকথার রূপসীর ছবি প্রাচীন কাল থেকে যেমন আঁকা হয়েছে, নূতন কবিও (যিনি তন্ময় অথচ শৌখীন) বসন্তের গান গাইবেন। একটি নারীর রূপচিত্র আসে। এই নারী নিথর হলেও কবিমনে প্রতিক্রিয়া জাগাবে। এর শরীর ছুঁলে দেখা যাবে পাথরের মতো হাত, শরীরে ননীর ছিরি (শ্রী)। অথচ তা হিরের ছুরির মতো শাণিত, চুল মেঘের মতো। এরই টানে কত মৃত মানুষের হাড় পাহাড় গড়েছে। অর্থাৎ এই রূপসীকে কেন্দ্র করে মানুষে-মানুষে লড়াই বেঁধেছে। প্রশ্ন ওঠে :

> হাড়েরই কাঠামো শুধু—তারি মাঝে কোনদিন হৃদয়-মমতা
> ছিল কই?

নারীর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। বাকি রূপবর্ণনা মনে হয় মিথ্যা। কেননা সেই নারী ভাষাহারা, নিথর। নূতন কবি যুগপ্রথাবশে সেই পাথর থেকে নারীহৃদয় গড়ে তুলতে পারবেন কি? শুধু প্রশ্নবাক্যের মালা সাজানো এখানে। সংশয় উদ্বেগ কাজ করে গেছে। চারজন নারীই যে জীবন্ত মানবী নয়, 'শুধু পটে লিখা'—এমন আমরা বুঝতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ গল্পে একটা নূতন দিক সঞ্চারিত হল নারী নিয়ে যুদ্ধের প্রসঙ্গে। নারীকে কামনার ধন জেনে নিজের সর্বস্ব সমর্পণের, আত্মবিসর্জনের অতীত এবং বর্তমান রচিত হল।

এই নারীরূপ বাস্তবের নয় বলে শ্রোতাদের একজন (নাকি সে কবিরই অন্য চেহারা?) ঐ গল্পগুলিকে 'তেপান্তরে' বলে উপহাস করল। সে অনুমান কল্পনার বিরোধী :

হয় তো অমনি হবে—দেখিনিকো তাহা,
কিন্তু শোনো,—স্বপ্ন নয়,—আমাদেরি দেশে কবে, আহা!—
যেখানে মায়াবী নাই,—জাদু নাই কোনো,—
এ দেশের—গাল নয়,—গল্প নয়, দু-একটা শাদা কথা শোনো!

এই গল্পে পাহাড়, নদী, সাগরের উল্লেখ নেই। একটি রোদে-পোড়া লাল দিনের কথা আছে জ্যোৎস্না, তারার আলোর বদলে। ঘুমভাঙানিয়া চোখে 'ছেঁড়া করবীর মত মেঘের আলোকে' এক রূপসীকে তিনি দেখেন খাটের উপর (পালংকে নয়) শায়িত অবস্থায়। অনেক রূপকথার গল্পে পড়া ঘুমন্ত কন্যার স্মৃতির সঙ্গে একে মেলাতে চান। কিন্তু দেখেন যে :

এ ঘুমানো মেয়ে
পৃথিবীর,—মানুষের দেশের মতন;
রূপ ঝরে যায়, তবু করে যারা সৌন্দর্যের মিছা আয়োজন
যে যৌবন ছিঁড়ে ফেড়ে যায়,
যারা ভয় পায়
আয়নায় তার ছবি দেখে!—

এর শরীরে নিষ্প্রাণতা নেই। কিন্তু পৃথিবীর স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে, তাতে ঘুণ ধরে গেছে। বুকের মধ্যে এদের ক্ষুধা নেই, আছে ব্যর্থতা। সাধহীন, সুখহীন এদের দিন কাটে। আরও চোখে পড়ে এদের চোখে ঠোঁটে অসুখের আক্রমণের চিহ্ন। কী যেন এদের কুরে কুরে খেয়েছে। এদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ, পশু ও মানুষ। এই নারীর ছবি পণ্যা নারীর। অথচ একে মেনে নিতে, (বাস্তবকে) অন্য শ্রোতারা অস্বীকার করল। এ নারী কথা বলে দ্বিতীয় সন্ধ্যা কাটানোর আমন্ত্রণ জানায়।

এ নারী নীরব নয় বলে সংলাপ আসে। এ নারী জীবন্ত তাই :

কালো খোঁপা ফেলিত খসায়ে,—
কি কথা বলিতে গিয়ে থেমে যেত শেষে
ফিক্ করে হেসে।....
খোঁপা বেঁধে ফের খোঁপা ফেলিত খসায়ে,—
সরে যেত দেয়ালের গায়ে
রহিত দাঁড়ায়ে

কবির সহানুভূতি জাগে। এখানে দৃষ্টির সংযোগহীনতার কথা আসে। তবু কান্নাভেজা চোখ দুটি বেদনা দেয়। তার আমন্ত্রণ আবার আসে। সংলাপের মালা তৈরি হয়। আগের বর্ণনাধর্মিতা ছেড়ে সংলাপের মধ্যে এই গল্প এগোয়। কবি দেখা দিলে সে আত্মপরিচয় দেয় :

বলিল সে, 'তোমার বকুল—
মনে আছে'—এগুলো কি? বাসি চাঁপাফুল?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে',—'ভালোবাস'?—হাসি পেল—হাসি!

গণিকার আবার ভালবাসা অথবা তাকে ভালবাসার প্রশ্ন এই সৌন্দর্য তান্ত্রিকের মনে হাসির সঞ্চার করে। মেয়েটি বোঝে যে, ভালবাসার প্রশ্ন এই জীবনে অর্থহীন। তাই ফুলের সঙ্গে তুলনা করে জানায় :

'ফুলগুলো বাসি নয়,—আমি শুধু বাসি!'

নারীর পণ্যারূপের আড়ালে এভাবেই তার হৃদয় নির্মম স্বীকারোক্তি জানায়। আমরাও আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ি।

কবি পাঠকের বিচলনের কথা ভেবে বাস্তবতার শেষ আঘাত হানেন :

জটার মতন খোঁপা অন্ধকারে খসিয়া গিয়াছে,—
আজো এত চুল!
চেয়ে দেখি,—দুটো হাত, কখানা আঙুল
একবার চুপে তুলে ধরি
চোখ দুটো চূণ-চূণ—মুখ খড়ি-খড়ি
থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি
সব বাসি—সব বাসি,—একেবারে মেকি!

রুক্ষ চুল, বিবর্ণ চোখ-মুখ স্বপ্নের নারীকে বাস্তবে আছড়ে ফেলে। আগের নারীরা ছিল নিষ্প্রাণ। এ নারীর প্রাণ আছে। কিন্তু লোভী মানুষ একে 'ফোঁপরার মতে করে' শুষে নিয়েছে। নারীর এই অমানী রূপ আমাদের বেদনার্ত করে।

এই কবিতাটিতে কথিকা-গল্পের একটা ঢং আছে। কিন্তু তারা এসেছে যুগে যুগে নারীকল্পনার অবাস্তবতা বোঝাতে। বাস্তবের নারী যখন আসে, তখন তার মধ্যে প্রেমহীনতা কিংবা প্রেমকে পণ্য করার রূপ স্পষ্ট হয়। জীবনানন্দ দাশ ক্রমান্বয়ে পাঠকের সামনে নারীর নানা রূপ ফুটিয়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত নারীর পণ্যা রূপে যুগের কৃত্রিম সৌন্দর্যঘোষণাকে উপহাস করেন। তাই প্রথম দিকের শব্দ-আয়োজন অনেক বেশি তৎসমবহুল। আর পণ্যা নারীর ছবি ও সংলাপ সাজাতে আশ্রয় নেন কথ্য গদ্যের এবং দেশি-ইতর শব্দের—ছেঁড়া ফাড়া যৌবন, শরীরের ঘুণ, অসাধ, খেয়ে নেওয়া, ফোঁপরার মত শোষা, খাটের উপরে পড়ে থাকা, ফিক্ করে হাসা, খোঁপা খসিয়ে ফেলা, চোখাচোখি, বাসি, আঁচলের খুঁট, চূণ-চূণ চোখ, খড়ি-খড়ি মুখ, মেকি। জীবনের রুক্ষতা বোঝাতে এই শব্দগুলি অনিবার্য ছিল।

আবার সংলাপ অংশে জীবনানন্দ জীবনকে মান্য করেছেন। এখানে সংলাপ বানানো হতে পারে না। জীবন থেকে উঠে আসা এসব কথাবার্তা একটি বাস্তব আবহাওয়া গড়ে তুলেছে। এই প্রসঙ্গ অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার, আবার তাতে কাব্যিক দৃষ্টিযোগ কবিতাটিকে কবিতা করে তুলেছে।

প্রবহমানতার কথা আগে তুলেছিলাম। এবারে দৈর্ঘ্য বা পঙ্‌ক্তির অসমান ব্যবহার ভাবা যাক। সমিল প্রবহমান পয়ার ছন্দ এখানে লেখকের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। ভালো কবিতায় এভাবে ছন্দ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

এবার ওঠে পরিকল্পনার কথা। কয়েকটি চরিত্র এনে গল্পের আভাস জাগলেও, কথাবার্তার আবহাওয়া রচিত হলেও কবির চোখে নারীর রূপ আড়ালে থাকে নি। এই কবিতাটি দীর্ঘ। কেননা যুগে যুগে অঙ্কিত নারীরূপের

অসারতা দেখানো হয়েছে। 'সোনার আঁচল খসা, হাতে দীপশিখা' করে যে নারীকে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, সেই কল্যাণময়ীর ব্যাবহারিক রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যুগের কথা বা বাণী (স্পিরিট অব্ দা এজ) এভাবে কবিব্যক্তিত্বের (স্ট্যাম্প অব্ পার্সোনালিটি) স্পর্শে নবরূপ পায়।

## ❑ উৎসগ্রন্থ ও প্রবন্ধ


১-২. আশিসকুমার দে (১৯৮৭), 'আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ', শিলালিপি।
(১৯৯০) 'আধুনিক বাংলা কবিতা : কৃত্রিমতার ধারণা', সমন্বয়ে, হুগলি।

৩. পবিত্র সরকার (১৯৮৫), 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি', সাহিত্যলোক।

৪. শিশিরকুমার দাশ (১৯৮৬), 'গদ্য পদ্যের দ্বন্দ্ব', দেজ পাবলিশিং।